বঙ্গবন্ধু : শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বন্ধু

অনুপম হায়াৎ

জাতির পিতা মহান নেতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) বাংলা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিরও বন্ধু। তাঁর জীবন ও কর্মে, চিন্তাভাবনায়, লেখায়, রচনায়, মননে, পৃষ্ঠপোষকতায়, স্মৃতিতে, প্রীতিতে, ভাষণে, বিবৃতিতে, বাণীতে ঋদ্ধ হয়েছে এদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। অন্যদিকে তাঁর ব্যক্তি জীবন, কর্ম, আদর্শ, স্বপ্ন নিয়েও দেশ-বিদেশে রচিত হয়েছে শত শত বই, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নাটক, গান, ভাস্কর্য ও চলচ্চিত্র।

বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার সংস্কৃতি'। তিনি আরো বলেছেন, 'ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ছাড়া কোনো জাতিই উন্নতি করতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি যে, জনগণই সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস'।

শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা-সৃজন ও মনন সম্পর্কে জানা যায় তাঁর নিজের লেখা গ্রন্থ, ভাষণ, অন্যের লেখা রচনা, স্মৃতিকথা ও সমকালীন সংবাদপত্র থেকে। ১৯৭১ সালের মার্কিন সাপ্তাহিক নিউজ উইক বঙ্গবন্ধুকে আখ্যায়িত করেছিল 'রাজনীতির কবি' হিসেবে। আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন, 'রাজনীতির নান্দনিক শিল্পী' হিসেবে। পাকিস্তান আমলে দেশের শিল্পীসমাজ বঙ্গবন্ধুকে আখ্যায়িত করেছিলেন, 'বঙ্গ সংস্কৃতির অগ্রদূত' হিসেবে।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন এবং জানতেন যে, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই তিনি রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে পরিপূরক হিসেবে দেখেছেন। হাজার বছরের বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে মন্থন করেই বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন রাজনীতির কবি এবং বিশ্ববন্ধুও। তাঁর বিচ্ছুরিত প্রভায় আলোকিত, সঞ্জীবিত ও স্পন্দিত গৌরবদীপ্ত হয়েছে এদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো।

পন্ডিতদের মতে শিল্প হচ্ছে আত্মার সংস্কৃতি। আর সংস্কৃতি হচ্ছে জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবনের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, আচরণ, রীতি, পেশা, ধর্ম, দর্শন, ভাবনা, বস্তুগত অর্জন, বুদ্ধিজীবীগত বিকাশ, বিনোদন প্রভৃতি। বঙ্গবন্ধুর মধ্যে হাজার বছরের বাঙালির এসব বৈশিষ্ট্য নান্দনিকভাবে প্রকাশ ঘটেছিল।

শৈশব-কৈশোরে জন্মস্থানের ভূ-প্রকৃতি, জনজীবন, পারিবারিক পরিবেশ, শিক্ষা ও ক্রীড়া সাহচর্য তাঁকে দিয়েছিল সাংস্কৃতিক মানস কাঠামোর উপাদান। তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে রয়েছে তাঁর উল্লেখ। তিনি লিখেছেন যে, শৈশব-কৈশোরে তিনি গান গাইতেন, খেলাধুলা করতেন, ব্রতচারী করতেন। বঙ্গবন্ধুর সাংস্কৃতিক মানস কাঠামো গঠনে বই এবং পত্রপত্রিকা বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। সেই ১৯৩০ দশকে তাঁর পরিবারে কলকাতা থেকে প্রকাশিত আজাদ, সওগাত, মোহাম্মদী, আনন্দবাজার, বসুমতী পত্রিকা রাখা হতো। তিনি এগুলো পড়তেন। কারাগারের রোজনামচায় তিনি লিখেছেন, 'বই আর কাগজই আমার বন্ধু'।

আমরা জানি বঙ্গবন্ধু সেই ১৯৪০ দশক থেকে ১৯৬০ দশক পর্যন্ত বিভিন্ন সংবাদপত্রেরও সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এসবের মধ্যে ছিল, 'মিল্লাত', 'ইত্তেফাক', 'নতুন দিগন্ত', 'বাংলার বাণী'। তিনি এসব পত্রিকায় স্বনামে ও ছদ্মনামে লিখতেনও। আর বই এবং সংবাদপত্র হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন। বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন রাজনৈতিক, সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম লেখক। তাঁর রচিত তিনটি গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'(২০১৩), আমার দেখা নয়াচীন' (২০১৭) ও 'কারাগারের রোজনামচা' (২০২০) ইতিহাসের স্বর্ণখন্ড হিসেবে বিবেচিত। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আরেকটি বড়ো আধার হচ্ছে লাইব্রেরি। তিনি বাড়িতে বিরাট লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন। আওয়ামী লীগ দলীয় কার্যালয়েও তিনি গড়ে তুলেছিলেন লাইব্রেরি। পাঠ বা অধ্যয়নকে তিনি রাজনীতির বোধ ও চর্চার অংশ ভাবতেন। আর বই হচ্ছে সংস্কৃতি ও বুদ্ধিভিত্তিক সমাজ গঠনের হাতিয়ার।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব দান ও অংশগ্রহণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সোনালি অধ্যায়। এর ফলে জাতীয় সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠন এবং পরবর্তীকালে বিশ্ব সংস্কৃতির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ভাষা শহিদ দিবসে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি অর্পণ, ভাষণ, বাণী, মিছিলে অংশগ্রহণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্মারক হয়ে আছে।

বঙ্গবন্ধুর সাহিত্যপ্রীতি, কবিতাপ্রীতি, সংগীতপ্রীতি কিংবদন্তি হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকদের কবিতা ও গান ছিল বঙ্গবন্ধুর আশ্রয়। জেল জীবনে, মুক্ত জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে তিনি তাঁদের রচিত গান ও কবিতা আবৃত্তি করতেন ও গাইতেন। রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা'কে তিনি জাতীয় সংগীত এবং নজরুলের 'চল

চল চল'কে রণসংগীত হিসেবে সাংবিধানিক মর্যাদা দিয়েছেন। ১৯৪১ সালে বঙ্গবন্ধু কবি নজরুল ও অন্যান্যকে ফরিদপুরে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে নজরুলকে তিনি বাংলাদেশে এনে নাগরিকত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু নজরুলের কবিতা ও প্রবন্ধ থেকে 'জয় বাংলা' স্লোগানটি গ্রহণ করেছেন। তাঁকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য, বাণী ও শ্রদ্ধা সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মূল্যবান উপাদান হয়ে আছে।

বঙ্গবন্ধুর সংগীতপ্রিয়তা সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তিনি বাংলাদেশের লোকগান, জারি-সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা পছন্দ করতেন। শিল্পী আব্বাসউদ্দিন, রমেশ শীল, সানজিদা খাতুন, শেখ রোকন উদ্দিন, শাহ আবদুল করিমের গান তিনি পছন্দ করতেন। সত্যজিৎ রায়ের 'গোপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির 'মোরা বাংলাদেশে থেকে এলাম', শৈলজানন্দের ছায়াছবি 'মানেনা মানা'র হবে হবে জয়, পান্নালাল ভট্টাচার্যের গাওয়া 'আমার সাধ না মিটল' প্রভৃতি গান বঙ্গবন্ধু পছন্দ করতেন।

কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাংবাদিকদের সান্নিধ্য বঙ্গবন্ধু খুব পছন্দ করতেন। জমিসউদ্দীন, জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, শাহাবুদ্দিন, নীলিমা ইব্রাহীম, মাজহারুল ইসলাম, মানিক মিয়া, এবিএম মুসা, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী প্রমুখ তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ছিলেন। চলচ্চিত্রের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আগ্রহ ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে। তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রী থাকা অবস্থায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' (১৯৫৭)। তাঁর আমলে (১৯৭১-১৯৭৫) বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ ও সাহিত্যভিত্তিক অনেক কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। তিনি চাষী নজরুল ইসলামের 'সংগ্রাম' এবং জাপানি পরিচালক নাগিসা ওশিমার 'রহমান : ফাদার অব বেঙ্গল' প্রামাণ্যচিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া তিনি 'রূপবান' এবং 'নবাব সিরাজদ্দৌলা' চলচ্চিত্রও দেখেছিলেন।

নাটক ও যাত্রাশিল্পের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর সক্রিয় অবদান রয়েছে। তিনি ১৮৭৬ সালের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করেন। এর ফলে বাংলাদেশে নাটক রচনা ও মঞ্চায়নের ক্ষেত্র সুগম হয়। তার অনুপ্রেরণায় স্বাধীনতা উত্তর পরিবেশে বাংলাদেশ নাট্য আন্দোলন বিকশিত হয়। নাটকে বাংলাদেশের ইতিহাস, জীবন, সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধ নতুন মাত্রায় পরিবেশিত হয় মঞ্চ, বেতার ও টিভিতে।

বঙ্গবন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতায় সক্রিয় উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন এলাকায় শিল্প ও সাহিত্য, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এর মধ্যে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও, তিনি চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, সিনেমা হল নির্মাণ, স্টুডিওর সম্প্রসারণের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন। তিনি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় গঠন করেছিলেন। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলা একাডেমিকে পুনর্গঠন করেছিলেন। এর ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা উন্নয়ন ও বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। তিনি নিজেও এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (১৯৭৪) উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আরো কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী' (১৯৭৪), সোনারগাঁওস্থ 'বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন', (১৯৭৫), নেত্রকোনাস্থ 'উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি', রাঙ্গামাটিস্থ 'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট' , বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র' প্রভৃতি। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। বিভিন্ন দেশের সাথে শিক্ষ ও সংস্কৃতি বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর আমলে চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ফলে বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিনিধি প্রেরণ, শিক্ষার্থী প্রেরণের সুযোগ হয়। ভারত, রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভিয়া প্রভৃতি দেশে বহু বাংলাদেশি শিক্ষার্থী উচ্চতর বিষয়ে লেখাপড়ার জন্য যায় এবং তারা ফিরে এসে বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নয়নে অবদান রাখে।

বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুপদী অবদান হচ্ছে তাঁর জীবন-কর্ম-আদর্শ ও স্বপ্ন নিয়ে রচিত অজস্র কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ভাস্কর্য ও চলচ্চিত্র। ইতোমধ্যেই তাঁকে নিয়ে দেশ-বিদেশে রচিত হয়েছে শত শত গ্রন্থ ও ফটো অ্যালবাম। এভাবেই বঙ্গবুন্ধ হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অম্লান নক্ষত্র; যাঁর বিচ্ছুরিত আলো জাতিকে দেখাবে এগিয়ে চলার পথ।

#

লেখক- চলচ্চিত্র গবেষক

১৫.১২.২০২১ পিআইডি ফিচার